Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 80–89
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে প্রকৃতি ও প্রান্তজন

সীমা সূত্রধর
ইমেল : simasutradhar458@gmail.com

Keyword
প্রান্তজন, প্রকৃতি, দারিদ্র্য, অনটন, দুর্যোগ, গরিব, জীবন, মানুষ, জীবিকা।

Abstract
সমাজের বহুকৌণিক পীড়নে আবহমানকাল ধরে প্রান্তিক মানুষেরা পদপিষ্ট হয়ে আসছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আকস্মিক আঘাত সেক্ষেত্রে তাদেরকে আরও এক ধাপ ভাঙনের মুখে এগিয়ে দেয়। প্রকৃতির নিবিড় আশ্রয় তাদেরকে বন্য আদিমতার সঙ্গে সভ্য সমাজের শ্রেণিকাঠামোর বর্বরতা থেকে আড়াল করে রেখেছে যুগান্তরব্যাপী। জীবন ধারণের অকৃত্রিম সৌজন্য শিখিয়েছে তাদেরকে। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে সহবাস করেও প্রকৃতির রুদ্র প্রভাবের কাছে তারা অসহায়। আত্মীয়তার হাতজালেও তাকে বশীভূত করতে পারেনি কখনোই। শুধু নির্যাতিত হওয়ার মানসিক শক্তি ধারণ করে তছনছ হওয়া প্রকৃতির কাছে পুনরায় আশ্রয় চেয়েছে। সামাজিক অভিঘাতের পাশাপাশি প্রকৃতির অসহযোগী স্বভাবের এই ভয়ংকর অভিঘাত প্রান্তজনকে পিছিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে বরাবর।

প্রান্তিক মানুষের দুর্ভোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগের নানা পালাবদলে। কখনো ঝোড়ো দুর্যোগের আকস্মিক আঘাত, কখনো বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, কখনো বন্যা পরিস্থিতি, খরা পরিস্থিতি বা অতি বর্ষণের বলীয়ান চেহারা সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে প্রান্তিক মানুষজনকে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর শাসনে বিপর্যস্ত হয় তাদের জীবন। নষ্ট হয় গরিব মানুষগুলোর স্বাভাবিক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা। পরাজয়ের ভাব নিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গরিব মানুষগুলো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রবলভাবে আহত হয় প্রান্তজনের জীবন ও জীবিকা। ভূমিসংলগ্ন মানুষগুলো প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খুঁজে পায় না । ফলে একদিকে ছিন্ন তাদের বাসস্থানের নিরাপত্তা, অন্যদিকে জীবিকার আশ্রয়টুকু। জীবিকার অভাবে অনটনের সর্বগ্রাসী প্রভাব আক্রমণ করে অভাবী মানুষগুলোকে। প্রাকৃতিক পীড়নের ফলে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে তাদের। জীবিকার সন্ধানে মানুষগুলো ক্ষেপা পাগল হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কখনো কখনো প্রয়োজনীয়তা হারায় পুরোনো জীবিকার গুরুত্ব। ফলে প্রান্তজনের জীবনধারণের পক্ষে তৈরি হয় নতুন সংকট। জীবন নির্বাহের দায়ভার গ্রহণ করার জন্য অনেক সময়ই তাদেরকে সরে আসতে হয় নৈতিক স্থাপনার বিন্দু থেকে। জীবনের স্বচ্ছ নীতি থেকে সরে এসে তারা অবক্ষয়ের পথ ধরে হাঁটতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির কাছে পরাজিত হয়েও তারা জীবনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। পুনরায় মানসিক নির্ভরতার উপর ভর করে উঠে দাঁড়িয়েছে। নতুন করে নির্মাণ করার স্বপ্ন দেখেছে। এই জীবন প্রত্যাশার শিকড় সন্ধানে অতি বাস্তব হয়ে আছে প্রান্তিক মানুষেরা। শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে নয়, প্রাকরণিক দিক থেকেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রান্তিক জীবনকে আত্মীকরণ করে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন অনিল ঘড়াই। তাঁর অসংখ্য গল্পের নামকরণে, ভাষা নির্মাণে বা উপমা ব্যবহারে এদের

যৌথ ভূমিকা লক্ষণীয়। গল্পের আঙ্গিক গঠনে প্রকৃতি ঘটিত সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে প্রান্তজনের জীবনের দুর্ভাগ্যকে রূপায়িত করে তুলেছেন লেখক।

অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে প্রাকৃতিক বিপর্যয় একটি অন্যতম নিয়ামক শক্তি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অবিন্যস্ত হয়েছে তাদের জীবনীশক্তি। কখনো বা অসংলগ্ন হয়েছে তাদের জীবনকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। প্রকৃতির কাছে পরাজিত মানুষগুলো তবু কখনো কখনো অপরাজেয় হতে চেয়েছে জীবনবোধে, জীবন পরিকল্পনায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আকস্মিক আঘাতে হতদরিদ্র মানুষগুলোর বিপন্ন পরিস্থিতির নানা ঘাত-প্রতিঘাত ধরা পড়েছে অনিল ঘড়াইয়ের বহু ছোটোগল্পে।

Discussion

বাংলা সাহিত্যের রাজপথে প্রান্তিক মানুষের প্রবেশচিত্র কোনও নতুন ইতিহাস নয়। 'নিম্নবর্গ' অভিধায় প্রচ্ছন্ন প্রান্তিক ধারণার চর্চা উনবিংশ শতাব্দির চিন্তাপ্রসূত হলেও তাত্ত্বিক পরিচয়ের চমক সরিয়ে রেখে ব্রাত্য, অবহেলিত, অস্পৃশ্য, শোষিত, বঞ্চিত, অন্ত্যজ, পিছিয়ে পড়া মানুষের পরিচয় প্রদানে বাংলা সাহিত্য বরাবর অগ্রসরমুখী। সাহিত্যর সদরপথ ধরে তাদের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব অনেকক্ষেত্রেই অসংকুলান হলেও; কখনোই তারা প্রত্যাখ্যাত নয়। বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে সমাজ বাস্তবতার সুস্পষ্ট পরিচয় নিয়ে ভূসংলগ্ন হয়ে আছে প্রান্তিক মানুষ। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকেই উচ্চবর্গের সামাজিক মর্যাদা ও আধিপত্য ছিল উচ্চে, নিম্নবর্গস্থিত মানবগোষ্ঠী সেখানে বর্ণগত, গুণগত, জাতিগত, পেশাগত বা বিত্তগত দিক থেকে চিরকাল অবমানিত ও অপাংক্তেয়। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থে নিচুস্তরের মানুষকে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে অধিকৃত না করার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র– বর্ণকাঠামোর ভিত্তিতে এই শ্রেণি বিভাজনে শূদ্রদেরকে নিচুতলার মানুষ হিসেবে দূরে সরিয়ে রাখা হতো সর্বদা। ঋগ্বেদের (১০/৯০/৫০) পুরুষসূক্তে চতুর্থ বর্ণজাত মানুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্রাহ্মণের জন্ম আদিপুরুষের মুখ থেকে, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রদের উৎপত্তি হয়েছে। পৌরাণিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই যারা মর্যাদালাভের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি, সামাজিক ব্যবস্থার বাস্তবিক পরিস্থিতিতে তারা যে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত ও ব্রাত্য হিসেবে পরিগণিত হবে সে বিষয় সংশয়াতীত। 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ' গ্রন্থে 'আর্য' শব্দের বিপ্রতীপ অবস্থানে 'ম্লেচ্ছ' শব্দটির ব্যাখ্যাপ্রদান করেছেন ড. সুবোধ দেবসেন–

> "আর্য শব্দের বিপরীত শব্দ হল ম্লেচ্ছ- এরা আদিম নিবাসী। এই ম্লেচ্ছ শব্দটির অর্থ অসভ্য, অসজ্জন ও নীচ বা হীন ব্যক্তি।"[১]

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সমাজের মূল অধিপতি। এছাড়াও সমাজের সূচীমুখ নির্ণীত হয়েছিল সুবিধাভোগী বিত্তবান মানুষ, পরিচালক-আমলা বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত মানুষদেরকে কেন্দ্র করে। আর্যজাতি আগমনের পূর্বে অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে যারা ছিল প্রত্ন অধিবাসী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভীল, ওঁরাও প্রভৃতি আদিম অদিবাসী বা অনার্য জাতির মানুষেরাই আর্য সভ্যতার সংঘাতে পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয় অসভ্য, বর্বর, ম্লেচ্ছ, দাস, শ্রেণির মানুষ হিসেবে। ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় তারাই শূদ্র বা নিম্নবর্গ পরিচয়ে অধীন জাতিতে পরিণত হয়। যদিও প্রচলিত আছে, আদিপুরুষের চরণজাত হলেও তারা ঘৃণ্য বা অবজ্ঞাত ছিল না। কারণ, আদিপুরুষ মাত্রেই তাঁর সকল অঙ্গ পবিত্র। শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানই সামাজিক ব্যাখ্যায় নীচ বা ম্লেছ জাতি হিসেবে চিহ্নিত।

অধীনতার মানদণ্ড স্বততঃই পরিবর্তনশীল। ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার বর্ণগত বিভাজনের চৌকাঠেই অনড় হয়ে থাকেনি অধীনতার সংজ্ঞা। দলিত, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক - এই সব পরিভাষাগুলোই পরবর্তীকালে একাত্ম হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনার প্রসঙ্গে। জাতিগত বা বর্ণগত শ্রেণি বিভাগের ঊর্ধ্বে সমাজের বৃহদাংশ মানুষের সাধারণ পরিচয়, তারা পিছিয়ে পড়া, তারা সমাজ কাঠামোর নিচে থাকা জনজাতি। সমাজ-ইতিহাসের বাস্তবতা অনুযায়ী দুটি মোটা রকমের বিভাজন বরাবর আমাদের সমাজকে বিভক্তিকরণ করে রেখেছে- একটি উৎপাদনকারী শ্রেণি, অন্যটি অনুদপাদক শ্রেণী। উৎপাদনকারী শ্রেণি চিরদিন সভ্যতার রথের চাকা সচল রেখেছে, পক্ষান্তরে তারাই শোষিত, নির্যাতিত হয়েছে ক্যাপিটাল কুক্ষিগত করে রাখা অনুদপাদক শ্রেণির কাছে। কর্তৃত্ব স্থাপন ও ক্ষমতা প্রদর্শনের নিষ্ঠুর কষাঘাত অনিবার্যরূপে নেমে এসেছে তাদের

উপর। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় আধিপত্যবাদী শাসনযন্ত্রে নিগৃহীত তারা। সাপেক্ষ বিচারে একটি বৃহৎ অংশের মানুষ অনুরূপভাবে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক -সবদিক থেকে অবদমিত, আধিপত্যের অধীন। মূল সমাজব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা থেকে পিছিয়ে তারা ক্রমশ পৌঁছে যাচ্ছে প্রান্তিক স্তরে। এই পিছিয়ে থাকা, অপাংক্তেয়, বঞ্চিত মানুষগুলোই প্রান্তজন ধারণায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে এই প্রান্তজনের সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের রূপরেখাটি উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১

প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পদচারণ বাংলা সাহিত্যে বহুপূর্ব থেকেই। কখনো নিঃশব্দে, কখনো বা স্বঘোষিত গর্বে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রকৃতির কোলেই ভারতীয় সভ্যতার জন্ম। অরণ্যানী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহমর্মিতার চিন্তাপ্রস্থান আধুনিককালেও লক্ষণীয় মানুষ ও প্রকৃতির আবেগপূর্ণ সৌহার্দ্যে। মানুষ ও প্রকৃতির গভীর আত্মিক সম্পর্কের কথা বারংবার স্থাপিত হয়েছে বাংলাসাহিত্যে। প্রাকৃতিক জগতের বিবিধ পরিবর্তন মানুষকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। আমাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম– সবকিছুর পিছনে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

> "বৈদিক মন্ত্রে মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সূর্য, জল, বাতাস প্রকৃতির এই সকল উপাদানগুলিকে প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। তারা বলশালী, উদার। কিন্তু কখনো কখনো ধ্বংসাত্মক।"[২]

ফলে মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ ভাবনায় তখন দেখা দেয় মানুষ ও প্রকৃতির বিরোধী প্রকাশ। পরিবেশের বিপর্যয় ঘটলে মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রকৃতি তখন প্রভুত্ব শাসন করে দ্বারস্থ জনজাতির উপরে। একদিকে দ্রুত শিল্পায়ন অন্যদিকে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব করার অদম্য বাসনা থেকে প্রকৃতির অস্তিত্ব যেমন সংকটাপন্ন, তেমনি প্রকৃতির বিরুদ্ধ পদধ্বনিও সন্ত্রস্ত করে তোলে সংলগ্ন মানবজাতিকে। প্রকৃতি তখন ভয়াল, ভীষণ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের শিকড়ে টান পড়ে। বিপন্ন মানুষ প্রকৃতির কোলে আশ্রয়ের সন্ধানে প্রার্থিত হয়েও তখন প্রত্যাখ্যাত। প্রকৃতি মানুষকে বিস্ময়াপন্ন করেছে, তার ভাবের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কিন্তু যেসব মানুষের জীবনপ্রণালী বিন্যস্ত হয় প্রকৃতির নিবিড় নিমগ্নতায়, প্রকৃতি তাদের কাছে সর্বস্বপ্রধান। প্রকৃতির প্রশ্রয়, তার রুক্ষতা, রুদ্রতাই সে শ্রেণির মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ আলেখ্য তৈরি করে স্বহস্তে। বিশেষত, সমাজের মূলস্রোত থেকে ছিন্ন হয়ে থাকা জনজাতির নিজস্ব মহাদেশ নির্মিত হয় প্রকৃতির একাত্ম নির্ভরতায়। প্রকৃতির ঘেরাটোপেই তাদের দৈনন্দিন আয়োজন। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের কথাকার মহাশ্বেতা দেবী থেকে শুরু করে দেবেশ রায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা প্রমুখের সাহিত্যের মূল উপজীব্যই মাটির গন্ধ আর ঘামলাঞ্ছিত নিম্নবর্গের অসহায় মুখচ্ছবি। এই সত্যের প্রতিফলন পাওয়া যায় আশির দশকের প্রান্তিক লেখক অনিল ঘড়াইয়ের কথাসাহিত্যেও। গ্রামীণ সমাজের হতদরিদ্র মানুষের কঠিন জীবন বাস্তবতাই তাঁর গল্পের বুনিয়াদকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গল্পের প্রেক্ষাপট হিসাবে তিনি তুলে ধরেছেন নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলার স্থানবিশেষ। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ, হাটগাছা, অনন্তপুর, দেবগ্রাম সহ মেদিনীপুরের অন্ত্যজ মানুষের দুর্বিষহ জীবনের কথাচিত্র স্পন্দিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। যেসব মাটিঘেঁষা মানুষের জীবনগঠনের চালচিত্র নির্ধারিত হয়েছে প্রকৃতির মর্জিয়ানাতে। গ্রীষ্মের শুরুতে কখনও ভয়াল খরার প্রাবল্যে, ঝড়-ঝাপটের আতঙ্কে, কখনও বাদলার দুর্যোগ বা বন্যার বিভীষিকায় গ্রামজীবনের সংবেদনশীল অবস্থানের কথা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য-সাম্রাজ্যে। প্রান্তজনের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সপক্ষে প্রকৃতি–পরিবেশের ভূমিকার অনিবার্যতা নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে অনিল ঘড়াইয়ের একাধিক গল্প-উপন্যাস। 'কোটাল', 'ঝিঙেফুল', 'বিলভাত', 'পোকাপার্বণ', 'বীজ', 'হাত', 'চরণ', 'খরার আকাশ', 'ইলিশ', 'পিঁপড়ের জীবন', 'ঠাই', 'লু', 'ঠুনকি', 'কোলভরা' ইত্যাদি গল্পে একদিকে প্রান্তিক মানুষের তেলহীন লম্ফর সলতের মতো প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকা, অন্যদিকে প্রকৃতির প্রচ্ছায়ায় তাদের জীবনের রূপরেখা ভাষাময় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি সেক্ষেত্রে কখনো উদারহস্ত হলেও কখনো বা করালগ্রস্ত বিভীষিকাময়। বিভিন্ন গল্পের আলোচনাসূত্রে প্রকৃতির এই বিরূপ আচরণের সংলাপ বিশ্লেষণাকারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

> "আবহমানকাল থেকে এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে আসছে কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। বিশ শতকের শেষদিকে এসে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়েছে যে, মানবসৃষ্ট অনেক কারণে বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। জলবায়ু

> পরিবর্তনজনিত সমস্যা কোনো একটি দেশের আঞ্চলিক সমস্যা নয়। মূলত, শিল্পোন্নত দেশগুলোর অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরণ, গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলে দ্রুত বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।"[৩]

প্রাকৃতিক বিপর্যয় নানারূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। কখনো অতি বর্ষণের ফলে বন্যা রূপে দেখা দেয়। কখনো বা প্রবল তাণ্ডবের সঙ্গে গগন ভেদ করে ভয়ংকর সামুদ্রিক উচ্ছ্বাস রূপে সবকিছু তছনছ করে দেয়। 'কোটাল' গল্পটি অসহায় দরিদ্র মানুষের সামুদ্রিক আতঙ্কের নির্যাস নিয়ে উঠে এসেছে। ভরা কোটালে সমুদ্র রাক্ষসীয় শক্তিতে ভয়ানক হয়ে ওঠে। সমুদ্রের নোনা উচ্ছ্বাস স্থানীয় মানুষের চোখের জলে এসে সংযুক্ত হয়। বিশ ফুট ঢেউয়ের আকারে সামুদ্রিক আক্রোশ বোল্ডারের বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ে গ্রামজীবনের কাঁচা বুকে। খেতের পর খেত, ভেড়ী, ঘর ভেসে যায় সামুদ্রিক তাণ্ডবের অসহনীয় পীড়নে। এমনই এক অমাবস্যার ভরা কোটালে নোনাজল খেয়ে পেট ফোলা দীনুর লাশ পাওয়া গেল 'কোটাল' গল্পে।

'পোকাপার্বণ' গল্পে পাওয়া যায় অনুরূপ সামুদ্রিক প্রসঙ্গ। ঊনপঞ্চাশ সালের ভয়ংকর ঝড়ের স্মৃতিচারণ পুনর্বার সন্ত্রস্ত করে তুলেছে হলা বুড়োকে। সামুদ্রিক জলস্ফীতির প্রাবল্যে জল ঘুঘরোর মতো ভেসে গিয়েছিল অসংখ্য গোরু ছাগল। হুরমুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল বহু মেটে বাড়ির কাঁচা শরীর। গ্রামের পর গ্রামের এই শ্মশানচিত্র আজও মর্মান্তিক শিহরণ হয়ে জেগে আছে হলা বুড়োর মগজে। ঝোড়ো দুর্যোগের অভিজ্ঞতায় সংবেদনশীল হয়ে আছে 'ইলিশ' গল্পটি। সামুদ্রিক শক্তির বীভৎসতা উপকূলীয় মানুষের মনে আতঙ্কের কম্পন তোলে সর্বদা। বিশেষত, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, ভরা কোটাল, মরা কোটালের মতো বিশেষ তিথিগুলোতে সমুদ্র হয়ে ওঠে বিভীষণ। আকস্মিক ঝড়ের স্বরযন্ত্রে সামুদ্রিক এলাকা হয়ে ওঠে স্পর্শকাতর। এইরকম একটি ঝড়ের রাতে রেণুর বাবার হারিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ধারণ করে আছে 'ইলিশ' গল্পটি। খরার আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে 'বীজ' গল্পটি। বৃষ্টির অভাব আর শুকনো খটখটে আকাশের ভাবমূর্তি গ্রামবাসীর কাছে ঘোষণা করে দিয়ে যায় খরার পূর্বকালীন আভাস। তীব্র দাবদাহে পুড়তে থাকে ঝোপজঙ্গল, গাছপালা। পুড়তে থাকে গরিব মানুষগুলোর মন ও মানসিকতা। খাদ্য আর জলের অভাবে অতিষ্ঠ মানুষজনের পাগলপ্রায় পরিস্থিতির করুণ অবস্থা ধরা পড়েছে 'বীজ' গল্পে।

প্রকৃতির বিরোধিতার নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিষ্কাশিত আছে 'খরার আকাশ' গল্পে। গল্পে বৃষ্টি-বাদলার অনুপস্থিতির সুযোগে রাগী মেজাজ নিয়ে চারিদিকে দাপটে বেড়াচ্ছে লু বাতাস। গরম বাতাসে অস্থির গ্রামবাসী। আর্থিক অনটনের দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েছে গরিব মানুষগুলো। এভাবে ভূমিনির্ভর দরিদ্র জনজাতির উপর প্রকৃতির গ্রীষ্মকালীন শাসনে সাক্ষী হয়ে থাকে 'লু', 'ঠুনকি' ও 'হাত' গল্পটি।

২

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার মতো কোনও প্রস্তুতি থাকে না তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলির। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেক্ষেত্রে হয়ে ওঠে একটি ভয়াবহ মানবিক সমস্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলগুলিতে জনপদ বেঁচে থাকে অস্তিত্বের তীব্র সংকট নিয়ে। বন্যা, খরা ভূমিকম্প, মহামারীর মতো প্রাকৃতিক ঘটনার রুদ্র রোষের কাছে মানুষের জীবন তখন নিতান্ত অসহায়, বিপন্ন, আর্ত। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার মারণযজ্ঞে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ঘরবাড়ি, গাছপালা, ক্ষেত-খামার সহ মানুষের যাবতীয় বসবাসযোগ্য বিন্যাস। বিপর্যস্ত হয় মানুষের বেঁচে থাকার প্রণালী। অগণিত প্রাণ হারিয়ে যায় দুর্যোগের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকায়। দারিদ্র্যসীমার নীচে যাদের অবস্থান সে-সব জনপদের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মস্ত এক অভিশাপের মতো। অস্তিত্বের সঙ্কটের পক্ষে একটি অতিরিক্ত সংযোজন। তাদের সর্বাত্মক নিঃস্ব জীবনে বিপন্নতার মাত্রাকে আরও একধাপ প্রকট করে তোলে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধারাবাহিক অন্বয় থেকে সরে এসে প্রাকৃতিক আগ্রাসনে নিষ্পিষ্ট হয়। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের বুবুক্ষু চরিত্রের অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে আছে 'কোটাল' গল্পটি। এই প্রাকৃতিক অভিঘাতে প্রবলভাবে আহত হয়েছে প্রান্তিক মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতি। পম্পার বাবার মৃত্যুর পাশাপাশি দুর্ভাগ্যের করাল ছায়া নেমে এসেছে নেপালের সমস্যাবহুল জীবনেও। সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে তার ছোট্ট দোকান। সামান্য পুঁজিসহ দোকানের যাবতীয় সম্পদ নষ্ট হওয়ায় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে নেপালের মনোবলের। ফলে একদিকে পম্পার বিধবা মায়ের লড়াই দারিদ্রের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে নেপালের জীবনসংকট তৈরি হয়েছে জীবিকাসংগ্রহ ও দিনাতিপাত ঘিরে। খুব

স্বাভাবিকভাবেই ছিন্নমূল নেপালের পরিচয়পত্র তৈরি হয়েছে ঠক, জোচ্চোর হিসেবে। রুজি রোজগারের আশায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় তাকে। রক্তখেকো মহাজনের হাত থেকে নিষ্পত্তি মেলে না নেপালের মতো প্রান্তিক অসহায় মানুষদের। ঠক–জোচ্চোর নেপালকে সরে আসতে হয় জীবনের স্বচ্ছ নীতি থেকে। সংসার নির্বাহের দায়ভার গ্রহণ করতে হয় তার সরলমতি সন্তানকেও। জীবনের তাগিদে খেয়ালীকে ছিন্নমূল হয়ে পাড়ি দিতে হয় দূর শহরের অজানা আতঙ্কের ঠিকানায়। ভাগ্যের করুণ পরিণতি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে 'ইলিশ' গল্পটিও। ঝড়ের দুর্বিপাকে রেণুর বাবার হারিয়ে যাওয়ার অপরাধে রেণুদের সংসার মুখ থুবড়ে পড়েছে চিরকালের জন্য। শারীরিক অক্ষমতার ভারী ওজন টেনে টেনে অবিবাহিত রেণুকে সমুদ্রলগ্নী হয়ে থাকতে হয় জীবিকার সন্ধানে। বিকলাঙ্গ রেণুকে পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে একাই উদ্দীপ্ত থাকতে হয় বিধবা মাতার অসহায় সংসারে।

'বিলভাত' গল্পে এসে দেখা গেল প্রকৃতির খেয়ালী চরিত্রের কাছে দরিদ্র মানুষের শোচনীয় পরাজয়। টানা চারদিন ধরে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলস্বরূপ গরিব মানুষগুলো হারিয়েছে বাসস্থানের নিরাপত্তা, জীবিকার আশ্রয়টুকুও। বিপর্যয়ের প্রভাবটুকু কাটিয়ে বাদলার কাছে একমাত্র অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি হলেও সেখানেও নৈরাশ্য। টানা চারদিন বুবুক্ষু থাকার যন্ত্রণা তাকে ক্রমাগত দগ্ধ করে। শ্রাদ্ধের বিলভাত তার কাছে হয়ে ওঠে একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের একটি প্রশ্ন–

> "খাদ্যাভাব কত আতঙ্কের হলে খাদ্যকে ব্রহ্ম বলতে হয়?"[৪]

খাদ্যলাভের প্রলোভনে বাদলা আসলে হয়ে ওঠে হর ঘোষের অশরীরী আত্মার প্রকাশ।

প্রাকৃতিক রোষ ভস্মীভূত করে দিতে পারে গরিব মানুষের প্রাত্যহিক স্থিরতাকে। 'খরার আকাশ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বৃষ্টি-বাদলের অভাবে প্রকৃতির মেজাজ তখন ফণা তোলা খরিস সাপ। প্রকৃতির বিষ দাঁতে ধরণী গর্ভবতী হবার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে নুনা মান্ডির মতো ভূমিসংলগ্ন মানুষেরা কাজহারা হয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। পরিচিত জীবিকানির্ভর হয়ে জীবনধারণ আর সম্ভবপর হচ্ছে না নুনা মান্ডির কাছে। জীবিকার অভাবে অভাব অনটনে প্রবলভাবে আক্রান্ত নুনা-শঙ্খীর সংসার। যার অনিবার্য পরিণতিতে অনটনের গলা টিপে হত্যা করার স্পৃহায় পাগল কুকুরে কামড়ানো মরা শুয়োরও লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় নুনা মান্ডির কাছে।

'বীজ' গল্পেও লক্ষ্য করা যায় প্রাকৃতিক রোষের আশ্চর্য প্রতিফলন। একমাস যাবৎ খরার রুদ্ররোষে অতিষ্ঠ গ্রামের সাধারণ মানুষেরা। মাটি ফেটে চৌচির। একফোঁটা বৃষ্টির জন্য চারিদিকে হাহাকার। প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে ভূমিনির্ভর জীবিকার গুরুত্ব। জীবিকার অভাবে নষ্ট হয়েছে মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্মতা। সৌজন্যের অভাবে মানুষগুলো সব ক্ষেপা পাগল। মাঠফাটা মাটির বুকে ফসলের আশ্রয় মিলছে না। ফলে সর্বগ্রাসী অভাব প্রবলভাবে আক্রমণ করছে এই অভাবী মানুষগুলোকে। দারিদ্র্যসর্বস্ব হয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করতে থাকে তারা।

'হাত' গল্পেও দারিদ্র্যের খল নায়কত্ব সর্বাধিকার বিস্তৃত করে আছে। খরার মরশুমে প্রচলিত জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় অনেকক্ষেত্রেই। তাই কাজহারা মাথুরকে স্বভূমি ছেড়ে উৎখাত হতে হয়েছে রুজির সন্ধানে। ন-মাসের ভরা পোয়াতি বউ ও কচি শিশুকে উপযুক্ত আশ্রয় দিতে সে অক্ষম। সংসারছিন্ন মাথুরের অভাবে ভুটারীর দারিদ্র্যমুখী প্রাত্যহিক দিন কাটে ভিখিরির মতো। ট্রেন থেকে উড়ে আসা দু'একটি কলার খোলা, কি ঠোঙার কোণায় লেগে থাকা বাসি মুড়ির সন্ধানে চোখ পেতে রাখে ভুটারী। ভুটারী-মাথুরের মতো মানুষদের এই পরিণতির পশ্চাৎপটে অবলীলায় দাঁড়িয়ে থাকে প্রকৃতিঘটিত কুচক্রের ভূমিকা।

৩

অবক্ষয় শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ক্ষয়প্রাপ্তি'। সামাজিক সূচকে নীতি-নৈতিকতার দুর্যোগ ও দুর্নীতি থেকেই এই অবক্ষয়ের সূচনা। সততা, ন্যায়, বিশ্বাস, ভালোবাসা, কর্তব্য নিষ্ঠা, ধৈর্য, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক মমত্ববোধ বা কল্যাণবোধ ইত্যাদি মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির অভাব ও অধঃপতনে চিহ্নিত হয় সামাজিক অবক্ষয়। সামাজিক অবক্ষয়ের নানা উপসর্গ স্থান বিশেষে সমাজ কাঠামোর ভিন্ন-রূপ আর্থব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা বা শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যবোধকেও নির্দিষ্ট করে তোলে। অনিল ঘড়াই তাঁর ছোটোগল্পে প্রান্তজনের কথা বলতে গিয়ে তাদের সামাজিক ও ব্যক্তি-

পরিসরে লক্ষণীয় এই বিচ্যুতির মানচিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষত প্রাকৃতিক অভিশাপের প্রতিফলস্বরূপ যখন আদর্শহীনতার ইঙ্গিত প্রান্তিক মানুষকে বিপথগামী করে তুলতে চায়, সামাজিক মূল্যবোধের মানদণ্ড তখন নিতান্ত দুর্বল হিসাবে প্রতিপন্ন হয়, নৈতিক অবক্ষয়ের ভিত্তিটিকে মজবুত করে তোলে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে 'ঝিঙেফুল' গল্পটির কথা। বন্যাপীড়িত আর্তের চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে ধর্মা প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল হয়েছিল কলকাতার রিলিফবাবুদের উপরে। কিন্তু শূন্যতার বুকে ভাসিয়ে দিয়ে একসময় তারা দিব্যি শহরমুখী হলে ভিক্ষাবৃত্তিই হয়ে ওঠে ধর্মার কাছে একমাত্র অবলম্বন। পরাশরের ভিক্ষাবৃত্তি অনুযায়ী ভিক্ষার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বহু ক্ষুধিত মানুষ ভিক্ষায় পাওয়া খাদ্যে জীবনধারণ করতেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন–

> "ভিখারি সব দেশেই, অন্তত প্রাচীনকালে ছিল তবে এদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই অন্নভিক্ষা নানা ধরনের শাস্ত্রের সমর্থন পেয়েছিল।"[৫]

কিন্তু,

> "রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন কখনোই ছিল না যাতে রাষ্ট্র থেকে ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণের দায় বহন করা হবে। তাই যার জমি নেই, যে ভাগচাষি সামান্য জমিতে মজুর খাটে যে, সে দুর্বৎসরে খাদ্য পেত না, বাধ্য হত ভিক্ষা করতে। তাই পেশাদার ভিক্ষুক ছাড়াও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজের শ্রম বিক্রি করেও খিদে মিটত না বহু তথাকথিত 'নিম্নবর্গের' মানুষের।"[৬]

জীবনরক্ষার যুদ্ধসাজ গ্রহণ করতে গিয়ে সততা রক্ষার ধর্মবোধ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় সে। ভেকধারী বৈষ্ণব সেজে চা-সিঙ্গারা, কিংবা মুঠো ভরতি চাল বা পরনের ছেঁড়া ফুলপ্যান্ট আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মা তখন নৈতিক অবক্ষয়ের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। অনটনের প্রভাবশালী বিচরণে বিচ্ছিন্নতা নেমে আসে তার পারিবারিক বৃত্তেও। কারণ, ছিন্নমূল হয়ে ধর্মার স্ত্রী তখন অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্ভ্রান্ত দাদার আশ্রয়ে।

অবক্ষয়ের পরিচয় নিয়ে উঠে এসেছে 'কোটাল' গল্পটিও। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নেপালের জীবিকা ধারণের সর্বস্ব সহায়টুকু খোয়া গেছে। প্রকৃতির অসহযোগী স্বভাবের ভয়ংকর অভিঘাতের পাশাপাশি সামাজিক অভিঘাতেও আজীবন নির্যাতিত হয় প্রান্তজনেরা। মহাজনের শোষণনীতি চাম এঁটুলির মতো লেগে থাকে তাদের গায়ে। রণজিৎ গুহ বলেন,

> "ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটি যে বিশিষ্টরূপে প্রকট হয় তা শোষক শোষিতের সম্পর্ক।"[৭]

ফলে, মহাজনের ভয়ে সর্বদা পালিয়ে বেড়ানো নেপালকে সরে আসতে হয় নৈতিক স্থাপনার বিন্দু থেকে।

নৈতিকতার চরম ব্যত্যয় নিয়ে উঠে এসেছে 'হাত' গল্পটি। খরা পরিস্থিতিতে তৈরি হওয়া কর্মহীনতা ও অভাব অভিযোগের দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য স্ত্রী–সন্তানকে নিঃসহায় রেখেই মাথুর কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয় দূরদেশে। স্বামীর অভাবে ভুটারীর সংসারে চলে চূড়ান্ত দৈন্যের উপদ্রব। একমুঠো খাবারের জন্য ছটফট করতে থাকে ভুটারীর ছোট্ট ছেলে। দীর্ঘ উপবাসের ক্ষুধার্ত শরীর ভুটারী পূরণ করতে চায় তার বহুকষ্টে সংগ্রহ করা বিষকচু দিয়ে। জীবনের ঝুঁকির বদলেও বুবুক্ষু পেট মহাশত্রু হয়ে ওঠে তার কাছে। কিন্তু ছোট্ট গুলাপ আশু খিদে পূরণের অতিরিক্ত আগ্রহ আর কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ভুটারীর অনুপস্থিতিতেই নষ্ট করে ফেলে উনানে বসানো সিদ্ধ বিষকচু। দীর্ঘ প্রত্যাশিত খাদ্যের নষ্ট পরিণতি ভুটারীকে নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় মুহূর্তে। চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয়ে ভুটারী সক্রোধে হনন করে তার মাতৃত্ব। সৌজন্যবোধ বা মমত্ববোধের সহিষ্ণুতা হারিয়ে ভুটারী মানবিক গুণাবলির নৈতিক অবস্থান থেকে সরে আসে। হ্যাঁচকা টানে গুলাপকে শূন্যে তুলে মেঝেয় আছড়ে মারে প্রথমে। গুলাপের ছোট্ট বুকে চড়ে বসে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে থাকে বীভৎসভাবে। তারপর দলা দলা ছাইমাখা কচুশাক গুঁজে দিতে থাকে গুলাপের নাকে–মুখে। এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের অনিবার্য পরিণতিতে সাক্ষ্য হয়ে থাকে গুলাপের ক্ষুধার্ত নিথর দেহ। দারিদ্র্যের অতিমারি গরিব মানুষগুলোকে কখনো কখনো এভাবে মূল্যবোধের স্তর থেকে নামিয়ে আনে বহুগুণ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রবল অত্যাচার নীতির ফলে সহনশীলতা, শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ সরে আসার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে 'বিলভাত' ও 'বীজ' গল্পটি। জীবিকার অভাবে বিনষ্ট হয়েছে গ্রামবাসীর পারস্পরিক সৌজন্য। ভাঙ্গা চালাঘরের মতো মানুষের মেজাজ এখন তিরিক্ষি। কেউ আর দয়ার চোখে দেখে না। উল্টে হাজার গণ্ডা কথা শোনায়। খিঁচিয়ে তেড়ে মারতে

আসে কেউ কেউ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিরূপ এই অবক্ষয়ের চেহারা স্থায়ী না হলেও তার সাময়িক স্থিতিও নিম্নবর্গের মানুষকে প্রবলরূপে অসহনীয় করে তোলে। 'বিলভাত' ও 'বীজ' গল্পটি এই প্রতিবেদনের সপক্ষেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্ব মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

৪

> "প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু যে মানুষকে সম্পদহীন, নিঃস্ব, উদ্বাস্তু করে তা নয়, অসহায়, আদিম অবস্থায় নিয়ে যায়। ধ্বংসস্তূপে নিঃস্ব, সম্বলহীন মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়, বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এটাই মানুষের অপরাজেয় এক মানবিক শক্তি।"[৮]

প্রকৃতির কাছে বারবার পদনস্ত হয়েও এই মানসিক ও মানবিক নির্ভরতার উপর ভর করেই জীবন প্রত্যাশার সেতু নির্মাণ করেছে অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পের ভেঙ্গে পড়া চরিত্রগুলি। শেষ সলতেটুকু নিভে যাওয়ার আগেও চাতকের মতো তারা জীবনপ্রার্থী হয়েছে বারংবার। নানাবিধ প্রতিকূলতার কাছে পরাজিত হয়েও জীবনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। বাঁচার স্বপ্নে মরিয়া হয়ে প্রস্তুত হয়েছে জীবনমুখাপেক্ষী নির্ভরতার জন্য।

প্রথমেই, অনিবার্যরূপে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে 'ঝিঙেফুল' গল্পটি। 'ঝিঙেফুল' নামটি গল্পে হয়ে উঠেছে অসাধারণ প্রতীকী। কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সযত্নে লাগানো শৌখিন ফুল নয়, নিতান্ত সাধারণ মানের একটি ফুল ঝিঙেফুল। কিন্তু গল্পে বেড়ার গা ঘেঁষে বেড়ে ওঠা হলুদ হলুদ ঝিঙেফুলগুলি প্রান্তিক মানুষের চোখের তারায় বেঁচে থাকা স্বপ্নের দিগন্তভূমি রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। বন্যাকবলিত ধর্মা বিভোর হয়েছে কঙ্কালগ্রস্ত লতার পরিবর্তে লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা ঝিঙেলতা ও ঝিঙেফুলের স্বপ্নে। উদ্বাস্তু ধর্মার কাছে দোদুল্যমান ঝিঙেফুলের স্বপ্ন এক অপরাজেয় মানসিক সম্পদের প্রতীকী হয়ে উঠেছে। গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এই মানসিক নির্ভরতার উপর অবলম্বন করেই পুনরায় বেঁচে থাকার আয়োজন করবে ধর্মা।

জীবন প্রত্যাশার দুর্দান্ত ইচ্ছাশক্তি নিয়ে উঠে এসেছে 'বিলভাত' গল্পটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ানক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পর যখন মানুষের মন ও মেজাজ তিরিক্ষে, মানুষের বেঁচে থাকার ভরসাটুকুও আশ্রয়হীন; তখনও চার দিনের না-খাওয়া বাদলা পাগল খিদে পূরণের স্বপ্নে মশগুল। বিপত্নীক বাদলা একদিকে পুতলিকে নিয়ে রচনা করতে চায় সুখগৃহ, অন্যদিকে প্রেমিকার মৌলিক দাবি পূরণে অভিযাত্রী। খিদে নামক প্রবৃত্তি ও যৌনমিলনাত্মক প্রবৃত্তির অনুপ্রেরণায় বাদলা প্রবলরূপে আকাঙ্ক্ষিত। হর ঘোষের শ্রাদ্ধের বিলভাতও তার কাছে হয়ে ওঠে পরম আরাধ্য বস্তু। হর ঘোষের আত্মাকে প্রদেয় সজনে ফুলের মতো গোটা গোটা ভাত, লোভনীয় মাছের মুড়ো সহ নানা ব্যঞ্জনপূর্ণ থালাটা হয়ে ওঠে বাদলার জীবনের চালিকাশক্তি। বেনেতলায় ভূতের মতো লুকিয়ে থাকা ক্ষুধার্ত শরীরটা জীবন প্রত্যাশার শিকড় সন্ধানে নিজেকে চমৎকাররূপে সংযত করে নিয়েছে। থালাটা এগিয়ে দিয়েছে প্রেমিকার ক্ষুধানিবৃত্তির দাবি পূরণে।

> "কর্মকাণ্ডের যুগে সংহিতাব্রাহ্মণে সকল দেবতার কাছে বিভিন্ন ভাষায় বহু প্রার্থনা আছে খাদের জন্যে; পরিসংখ্যানগতভাবে দেখলে অন্য কোনো কাম্য বস্তুর জন্যেই অত প্রার্থনা নেই। অতএব খাদ্যাভাব সমাজের একটি স্থায়ি ও ব্যাপক অবস্থা।"[৯]

ফলে ক্ষুধানিবৃত্তির দাবি পূরণে বাদলা তখন উদ্দীপ্ত এক জাদুকর।

অমানবিক শক্তির চূড়ান্ত পরিচয় নিয়ে 'হাত' গল্পটি উঠে এলেও দূরাগত স্বপ্ন নির্মাণে উজ্জ্বল হয়ে আছে চমৎকারভাবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ভুটারী তার সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু অপরাধবোধে দগ্ধ ভুটারী বিসর্জন দিয়েছে তার হাতদুটো। গুলাপকে সন্তানরূপে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় তার মাতৃত্ব উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ভুটারীর চোখে স্বপ্নের ঝিলিক। অপত্যস্নেহে ভুটারী উর্বরা করতে চেয়েছে তার গর্ভগৃহ।

'চরণ' গল্পটি আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিয়ে উঠে এসেছে। মড়কের প্রতিকূলতায় মানুষের জীবনবিন্যাস যখন অসংলগ্ন, অসংযত; ভাগাড়জীবী চরণ তখন সেই প্রতিকূলতার সুবিধা গ্রহণ করতে চেয়েছে। গ্রীষ্মের খরাবেলায় ভাগাড় অবলম্বন করে বেঁচে থাকা একপ্রকার অসম্ভব। বিপন্ন চরণ তাই মড়কের মতো অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের প্রত্যাশী হয়ে বেঁচে থাকে। বর্ষাকালে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে বা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে মড়কের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই দুর্যোগের সুযোগ গ্রহণেই চরণ দারিদ্র্যের ক্ষুধার্ত গহ্বর পূরণ করার অভিলাষে উন্মুখ।

'বীজ' গল্পে দেখা যায় টুনিয়ার শান্ত চোখে সবুজ স্বপ্নের আঁকিবুকি। খরাকালীন রুষ্ট প্রকৃতির বিরুদ্ধচারিতায়ও টুনিয়া, গমিয়া স্বপ্ন দেখেছে ফলনশীলা পৃথিবীর। বর্ষার সান্নিধ্য চেয়ে উন্মুখ মানুষগুলো আগামী সচ্ছল জীবনের পরিকল্পনা বুনন করতে চেয়েছে। এই প্রত্যাশার শিকড়েই অতি বাস্তব অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পের অন্যান্য চরিত্ররা।

৫

স্বতন্ত্র প্রাকরণিক দীপ্তি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা উঠে এসেছেন অনিল ঘড়াই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রান্তজনের জীবনের আধেয়কে তিনি ধারণ করছেন তাঁর সাহিত্যে। তাদের জীবন বৃত্তান্তের অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণই তাঁর গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গল্পলিখন বা উপন্যাস রচনা তাঁর কাছে আকস্মিক আবেগের প্রকাশ নয়। গল্পের আঙ্গিক নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি প্রান্তজনের জীবনধারণকে আত্মীকরণ করে প্রস্তুতির দিকে এগিয়েছেন। লেখকের ব্যক্তি জীবন-পরিসর অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, জাতিগত পরিচয়ে তিনি নিজেও ছিলেন হাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত। দেবেশ রায়ের ভাষায় বলতে হয়,

> "দলিতজীবনই দলিত লেখকদের একান্ত নিজস্ব, আর কোনো লেখককে তো দলিতের জীবন কাটাতে হয়নি– এই নিজস্বতার বোধ থেকে, নিজের জীবনকে নথিবদ্ধ করার দায় থেকে, আর এর এই জীবনযাপনের কথাটাই তার অভিজ্ঞতার সারাৎসার এই প্রতীতি থেকে, আর এর চাইতে নিজস্ব তার আর কিছু নেই এই অনুভব থেকে দলিত লেখক আত্মস্মৃতিকেই তাঁর প্রধান প্রকরণ করে তুলেছেন।"[১০]

এছাড়াও কর্মসূত্রে অনিল ঘড়াই প্রান্তিক অঞ্চলের নানা প্রান্ত ছুঁয়ে গেছেন বিভিন্ন সময়ে। ফলে অন্ত্যজ জীবনের সমাজবাস্তবতা শুধু তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু অধিকার করেনি, প্রাকরণিক দিক থেকেও লেখক তাকে সর্বাধিকার দান করেছেন। খুব স্বাভাবিকবাবেই অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পের শৈল্পিক বিন্যাসে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে প্রান্তজনের জীবনবাস্তবতায় জায়মান সমস্যার নানাদিক। অনিল ঘড়াই যে প্রান্তিক, অন্ত্যজ মানুষের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে, প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষসংলগ্ন প্রতিবেশই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে গল্পের চরিত্র সৃষ্টি, তাদের ব্যবহৃত ভাষা, উপমা ব্যবহার সর্বস্থানে প্রকৃতি-পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। বিশেষত এই দরিদ্র শ্রেণির মানুষকে প্রবলভাবে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে প্রাকৃতিক শক্তির বলশালী প্রকাশের কাছে। তাই গল্পের অবয়ব সৃষ্টিতে সহজাতভাবে অধিকার লাভ করেছে প্রাকৃতিক শক্তির প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ। বিশেষত গল্পের নামকরণেই দেখা যায় তার একচ্ছত্র অধিকার।

প্রসঙ্গত, আসা যাক 'কোটাল' গল্পের অনুষঙ্গে। গল্পকার নামকরণেই নির্দিষ্ট করে দিলেন প্রাকৃতিক শক্তির বাস্তবতা। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের কাছে ভরা কোটাল, মরা কোটালের মতো তিথিগুলি রীতিমতো ভীতিজনক। এই বিশেষ তিথিগুলোতেই প্রাকৃতিক শক্তির অকৃপণতা বীভৎস আকার ধারণ করতে পারে। লক্ষণীয়, কোটালের বিশেষ ক্ষণেই গল্পে প্রাণ হারিয়েছে পম্পার বাবা। গল্পের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, প্রতীকী ভাষায় কোটাল দরিদ্র জীবনের বিপর্যয়কেই চিহ্নিত করতে চেয়েছে। খেয়ালীর মর্মান্তিক পরিণতিতে তার বাবা নেপালের প্রতিক্রিয়া বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়ের মৃত্যুর শোকে আছড়ে পড়েছে তার অনুভূতিশীল হৃদয়। সেখানেও দেখা যায় প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীকী প্রকাশ—

> "একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপে নেপাল। বোল্ডারের গার্ডওয়াল ভেঙ্গে যাচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। ফাটল ধরেছে পুরনো বাঁধে। অমবস্যার কোটালে নেপালের দু-চোখে দুটো সমুদ্র।"[১১]

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র খেয়ালীর নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যের দাবিদার। এ যেন প্রকৃতিরই খেয়ালী রূপ। যাকে প্রকৃতিছিন্ন করে শহরের ইট–কাঠ-পাথরে বাঁধতে গিয়ে চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটে গেল। উপমা ব্যবহারেও গল্পের অন্যত্র এসেছে প্রকৃতির প্রসঙ্গ। পম্পাকে বাঁধার জন্য তার মা প্রায়শই বলেছে -

> "মানুষের জীবন ফুঁসে ওঠা সমুদ্র নয়। মেয়েমানুষ তো বর্ষার নদীর মতো, তাকে বাঁধ না দিলে সব ভাসিয়ে দেয়।"[১২]

গল্পের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এভাবে দেখা যায় প্রাকৃতিক শক্তি ও মানুষের সহাবস্থান।

'লু' গল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নামকরণ নির্বাচনে লেখক প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের স্বরূপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। লু শব্দটি প্রাকৃতিক নিষ্ঠুরতার প্রতিনিধি হিসাবে যতখানি উঠে এসেছে তার চেয়েও দারিদ্র্যতার আগ্রাসী ভূমিকা আর প্রান্তজনের জীবনের দুর্ভাগ্যকেই প্রতিপাদ্য করে তোলে। অসহায় মানুষগুলোর ক্রমাগত মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থানকেই প্রকৃতিঘটিত

সঙ্কটের মাধ্যমে রূপায়িত করতে চেয়েছেন লেখক। তাই, ভাষারীতি নির্মাণে, উপমা ব্যবহারে গ্রীষ্মকালীন অস্থিরতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় জীবনের দুর্বিপাককে তুলে ধরার পাশাপাশি আঙ্গিক গঠনেও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। উল্লেখ করা যেতে পারে 'খরার আকাশ' গল্পটির কথা। এক্ষেত্রেও লেখক প্রকৃতির বিপর্যয়কালীন অবস্থাকে নামকরণের অনিবার্য আয়ুধ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকাটা খরার আকাশের মতোই প্রতিকূল। তাদের এই প্রতিকূল যাপনকে পরিবেশের প্রতীকী শরীরের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন লেখক। কাঠামোগত বিন্যাসে প্রয়োগ করেছেন খরার আকাশের নানা প্রসঙ্গ। শিল্পসচেতন লেখক অনিল ঘড়াইয়ের এই অনন্য শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রকৃতি প্রসঙ্গ জড়িত অন্যান্য ছোটোগল্পগুলিতেও।

তথ্যসূত্র :

১. দেবসেন সুবোধ, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩০
২. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৯, পৃ. ১১০
৩. মাওলা, আহমেদ, বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ: ঝড় জলোচ্ছ্বাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১৬৯
৪. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১১৩
৫. তদেব, পৃ. ১১৪
৬. তদেব, পৃ. ১১৫
৭. ভদ্র, গৌতম, এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, নিম্নবর্গের ইতিহাস, কলকাতা : আনন্দ পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ৪১
৮. মাওলা, আহমেদ, বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ: ঝড় জলোচ্ছ্বাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ১৭১
৯. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১০৯
১০. রায়, দেবেশ, সংকলক ও সম্পাদক, দলিত, নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১৭
১১. ঘড়াই, অনিল, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪, পৃ. ২২৫
১২. তদেব, পৃ. ২২২

আকর গ্রন্থপঞ্জি :

১. ঘড়াই, অনিল, অনিল ঘড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪
২. ঘড়াই, অনিল, অনন্ত দ্রাঘিমা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০০৯
৩. ঘড়াই, অনিল, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪
৪. ঘড়াই, অনিল, দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান, কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ১৯৯৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. আজাদ, হুমায়ুন, নারী, কলকাতা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১৭
২. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৯
৩. দেবসেন সুবোধ, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৪৫
৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, আখ্যানের সাতকাহন, কলকাতা : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০৫

৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসে বিনির্মাণ, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০১০
৭. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬
৮. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৮
৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল, কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০০১
১০. রায়, দেবেশ, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ১৯৯৪
১১. রায়, দেবেশ, সংকলক ও সম্পাদক, দলিত, নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৭
১২. সেন মজুমদার, জহর, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, কলকাতা : পুস্তক বিপণী, ২০০৭

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১. কর্মকার, লক্ষ্মণ, সৃজন, নভেম্বর ২০১৯
২. মুদি, দীপক, এবং আশিস রায়, সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণি এবং প্রান্তিক পত্রিকা, মে, ২০১৮
৩. মল্লিক, দীপঙ্কর, তবু একলব্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮
৪. শীল, বিকাশ, জনপদ প্রয়াস, মাঘ, ১৪১২